হঠাৎই এখানে কোথাও ফেরত যেতে ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব জীবনে... উত্তাল জোড়াসাঁকো বাড়ি স্বাধীনতার যুগ আবার একাধারে অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চকর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির স্থাপত্য। বাড়ির মহিলাদের জন্য নিজস্ব আলাদা ঘর। মহিলাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখন হয়ত বাড়ির মহিলাদের সেই বাহিরের রূপটি প্রকাশ পায়নি। পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকো বাড়িতে সর্বত্র যাতায়াত ছিল সমস্ত রকমের সংস্কৃতিবান, বুদ্ধিজীবী, দেশপ্রেমী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গোঁড়া স্বদেশী উগ্রবাদী মানুষজনের। হয়ত মানুষ রবীন্দ্রনাথ কোথাও তখন থেকেই মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; যেখান থেকে তার ঘরে বাইরের শুরু। আর আত্মকথা না বললে হয়ত সত্যিকারের নিজের ভেতরকার সত্যকে প্রকাশ করা যায় না।

মানুষের ভেতরকার ও বাইরের সত্যের সন্ধানের পথ হিসেবে আত্মকথার মাধ্যমে উপন্যাস রচনা সেই যুগে এক অসাধারণ পদক্ষেপ বলে মনে হয়। খানিকটা ভারতের প্রাচীন পারম্পরিক ধারারও প্রভাব বলা যায় অর্থাৎ ভারতের পুরাণ ও নীতিকথা সাল, তারিখ, গ্রন্থপঞ্জী ভিত্তিক না হয়ে বরং মানুষের স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর মৌখিক বর্ণনা/কথোপকথনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল।

সেই পারম্পরিকতার এক আধুনিক সংস্করণ হিসেবে ‘ঘরে বাইরে’কে ভাবা যেতে পারে।

‘আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না।... কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল।... আমি কি তখন রাজবাড়ির বৌ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর।’ (পৃষ্ঠা 483, ঘরে বাইরে)

বিমলার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগের এই বোধহয় প্রথম আলোর প্রবেশ। অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের অবকাশের গভীরে প্রবেশ করা ও তাকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার এ ছিল এক অদম্য বাসনা।

‘আমার মন বললে আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।’ (পৃষ্ঠা ৪৮৪, ঘরে বাইরে)

এই উপন্যাসকে যদি তিনতলা বাড়িতে ভাগ করা যায় তাহলে এ বোধহয় প্রথম তল। কারণ বিমলাই হল প্রথম মানুষ যাকে ভিত্তি করে বাহির জগতের প্রশ্ন আসে। কারণ নারী একা নয়, পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে বাহিরের

সঙ্গে যোগাযোগের পদক্ষেপ হিসেবে সেই যুগের ছবিকে ভাবা যেতে পারে। আবার যেখানে বিমলার মতে পুরুষ মানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। (পৃষ্ঠা ৪৭৯, ঘরে বাইরে)।

সেক্ষেত্রে বিমলা ঘরে এক সফল নারী হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন। বোধহয় এই সফলতা বা আত্মতৃপ্তির পরই তিনি যুক্ত হতে চেয়েছিলেন বাইরের জগতের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথও বোধহয় এখানে ভারতীয় নারীকে বাইরের সঙ্গে যুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানে অবশ্য জনসমক্ষে আসতে বিমলাকে মুগ্ধ করে সন্দীপবাবুর তথাকথিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বণি। ঘরে বাইরে কথাটার সঙ্গে কোথাও সৃষ্টি ও বিনাশের যোগাযোগ আছে। এই উপন্যাসের সমাপ্তিও রবীন্দ্রনাথ খানিক দুঃখজনক, অপ্রিয়সত্যি ও এক রহস্যময় জায়গাতে এসে শেষ করেছেন। যেখানে সবকিছুর শেষ হয়েও অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। শেষ পর্যায়ের যে অদৃশ্য বিনাশ ঘটেছে সেই বিনাশের আভাস প্রথম উল্লেখ রয়েছে সন্দীপবাবুর আত্মকথাতে... 'দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করতে পারবো সেই দিনই দেশ আমার হবে।' (পৃষ্ঠা ৪৯৩, ঘরে বাইরে)

উগ্রবাদী স্বাদেশিকতার জন্মও এখানে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বহু দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বদেশীর নাম গোঁড়া উগ্রবাদ নয়। সেক্ষেত্রে উনি নিজেও সরাসরি উগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমকেও তার বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে এই শান্তিনিকেতন বা বেঙ্গল স্কুল আন্দোলনকে সর্বভারতীয় দেশজবোধের আন্দোলন হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। প্রথম পর্যায় যে সন্দীপের আত্মকথা ব্যক্ত করেছেন তাতে পুরোপুরি সেই কঠোর উগ্রবাদী, নীতিবিরোধী স্বাদেশিকতার এক দিককে তুলে ধরেছেন। যার প্রতিফলন আজও সমসাময়িক রাজনীতিতে বিভিন্নভাবে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনটি মানুষের আত্মকথার মাধ্যমে চেয়েছিলেন সেই শান্ত, সৌম্য বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শী সম্পন্ন স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তুলতে। যার মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন। এই উপন্যাস বোধহয় তারই এক ভিত্তিপ্রস্তর। সঙ্গে সঙ্গে পর্দানসীন নারীর সমাজের প্রতি দায়িত্বের রাস্তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই উপন্যাসে চন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি পরিষ্কার করে দিয়ে চেয়েছিলেন যে, ধৈর্য্য ও দূরদর্শীতার বিকল্প নেই।

‘চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছটফট করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনাকে বাঁচিয়েছে তারা ছটফট করেনি, তারা কাজ করেছে। কাজটা যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।’ (পৃষ্ঠা ৫০৪, ঘরে বাইরে)

ব্যক্তিগতভাবে ঘরে বাইরের দ্বিতীয় তলে রাখবো সন্দীপবাবুর চরিত্রকে। যেখানে তিনি সেই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মূল সূত্র বিমলার উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে। কিন্তু বিমলার কথায় ‘দেবতার অক্ষয় তূণ তার হাতে আছে কিন্তু তূণের মধ্য আছে দানবের অস্ত্র। সেই অস্ত্রই হয়তো সমস্ত আবার মাটিতে মিশিয়ে দেয়। (পৃষ্ঠা ৫৬০, ঘরে বাইরে)

এই বোধের পরেও কিন্তু বিমলা থেমে থাকতে পারেনি।

‘ঘরে বাইরে’-কে যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় তাহলে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আজও খুব প্রাসঙ্গিক, কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানে বারবার মানবজাতির ও নিজের ভেতরকার সত্যের সন্ধান করেছেন। সেই সত্য এমন সত্য যা প্রাচীনকাল

থেকে রসদ নিয়ে বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। অন্দরমহল ও বাহিরমহলের এক অন্য পর্যালোচনা যেখান এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে যা কখনোই আলঙ্করিক রূপে আসেনি। এই বিবরণ পাঠক-পাঠিকাদের অন্যভাবে ভাবতে সাহায্য করে। এই খুঁটিনাটি যে শুধু পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে থেমে গেছে তা নয়, তা জড়িয়ে পড়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঘরে বাইরে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিশেষ পর্যালোচনা ও তার শুদ্ধিকরণের পথও বটে। যা এক সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন দর্শন, শিক্ষা ও শান্তিনিকেতন আশ্রমেও প্রয়োগ করেছিলেন। যেখান থেকে এক বিশুদ্ধ ধারা/শৈলী রচনা হয়েছিল যা কোন অনুকরণ নয় কিন্তু বহু কিছুর থেকে পরিশ্রুত এক নতুন জাগরিত রূপ অর্থাৎ তার নিজের ভেতরে ভাবনার উপলব্ধির এক নবীন সংস্করণ মানবজাতিকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই স্থাপত্যের তৃতীয় তলে আছে 'নিখিলেশ'। যাকে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন বা আত্মকথার মাধ্যমে (উপন্যাসের মাধ্যমে) নিজের কথাও কাউকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন। যা বোধহয় নিখিলেশের আত্মকথা।

'দাম্পত্য আমার ভেতরের জিনিস সে তো কেবল আমার গৃহস্থ আশ্রম

বা সংসার যাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেই জন্যই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয় আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা বোঝাতে পারবো না। আমি হয়ত অদ্ভুত। সেই জন্যই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরের ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কি করে? যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। (পৃষ্ঠা ৫৬৭-৫৬৮, ঘরে বাইরে)

রবীন্দ্রনাথ কোথায় নিখিলেশের মাধ্যমে সেই গভীর সত্যকে দেখা ও তাকে অনুভব করার কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি সেই ঘরে বাইরে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখান থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম সত্যিকারের জীবনের অর্থকে খুঁজতে পারে। যদিও তাঁর উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তৎকালীন সমাজ ও স্বাদেশিকতা কিন্তু তার পরিণতি শুধু সেই যুগ নয় তাঁর ব্যপ্তির বিস্তার আজও অনুভব করা যায় যদি সত্যিকেই সেই সত্যের সন্ধানের পথিক হন ঘরে বাইরে।